এলে তো উৎকট রকমের গম্ভীর হয়ে যায়। মাধ্যমিক নিয়ে কহ্লার মধ্যে যে আজকাল ফোবিয়া কাজ করে সেটা হিরণ্য বুঝে গেছে। গত দুবারেই কহ্লা মাধ্যমিক টপকাতে পারেনি। প্রথমবার তো পরীক্ষাটাই দিতে পারল না, দ্বিতীয়বারও অসুখটার জন্যেই... নয়তো কহ্লা আজকে হিরণ্যের সঙ্গেই উচ্চমাধ্যমিক দিত।

কিছুক্ষণ আগেই যখন কহ্লা অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে বেরিয়ে আসছিল প্রিন্সিপালের রুম থেকে তখনই কয়েকটা ছেলেমেয়ে টিটকিরি দিচ্ছিল—'স্লিপিং বিউটি। স্লিপিং বিউটি।'

একটা ছেলে আবার হাত-পা নেড়ে কবিতাও বলছিল, 'উনিশটি বার ম্যাট্রিকে সে, ঘায়েল হয়ে থামল শেষে।'

এইসব শুনলে হিরণ্যের নিজেরই রক্ত গরম হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে ছেলেটার নাকটা ফাটিয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু কহ্লার কোনো হেলদোল নেই। মেয়েটা কি অবলীলায় অপমান হজম করে সেটা এই দু-বছরে দেখেছে হিরণ্য। অন্য কোনো মেয়ে হলে ঠিক কেঁদে ভাসাত।

আজকে কোনো কারণে কহ্লাকে বেশ রিল্যাক্সড লাগছে। কে জানে, হয়তো ভেবেছিল এই বছর স্কুল থেকে নামটাই পাঠায়নি। এখন মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডটা পেয়ে দুশ্চিন্তার খানিক অবসান, মনটা ভালো আছে। হিরণ্য খোঁচাখুঁচি করতে চায় না।

মাধ্যমিকের পরেই উচ্চমাধ্যমিক। আর একমাস মাত্র বাকি। এমনিতে হিরণ্যদের এখন ছুটিই চলছে। আজকে প্র্যাকটিক্যালের খাতা জমা দিতে আসা। সেসব চুকে বুকে গেছে অনেকক্ষণ। হিরণ্যের আজকে না এলেও চলত, প্র্যাকটিক্যালের খাতা জমা দেওয়ার আরও দু-তিন দিন পড়ে আছে। আজকে কহ্লা মাধ্যমিকের অ্যাডমিট নিতে আসবে বলে, হিরণ্যও এসেছে। বিগত দু-বছরে কহ্লা হাতে গুনে যে কয়দিন স্কুলে এসেছে, পৃথিবী উলটে গেলেও হিরণ্য সেই দিনগুলো স্কুল কামাই করেনি। কহ্লাকে স্কুলে একলা ছাড়তে হিরণ্যের সাধ নেই। টিংকাদের গ্রুপটার সঙ্গে অনেকদিন ধরেই একটা চাপা রেষারেষি চলছে। উপরন্তু কহ্লার ব্যাপারেও হিরণ্য একটা খবর জেনেছে, যেটার সত্যমিথ্যা এখনও যাচাই করা হয়নি।

'আজ কত তারিখ রে?' কহ্লা প্রশ্ন করে।

'২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯।' একটা নতুন গেম শুরু করতে করতে, হিরণ্য বলে ওঠে।

'২০০৯ আমি জানি। তাহলে এই বছর বইমেলা শেষ হয়ে গেল।' কহ্লা বলে।

'হবে হয়তো। কেন? তুই যেতিস?' হিরণ্য জিজ্ঞেস করে।

‘কালসন্দর্ভা’ সিরিজের দ্বিতীয় বই

ফ্যান্টাসি থ্রিলার

কুহককাল

অঙ্কিতা

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

কুহক পক্ষ

"চিতা প্রদক্ষিণ করা হইলে, পুরোহিত কঙ্কাবতীকে মন্ত্র পড়াইলেন। শেষে কঙ্কাবতী, রক্তবতীর নিকট হইতে নক্ষত্রের মালা দুই ছড়া চাহিয়া লইলেন। চিতার উপর আরোহণ করিয়া এক ছড়া মালা খেতুর গলায় দিলেন, এক ছড়া মালা আপনি পরিলেন। তাহার পর, চিতার উপর, স্বামীর বামপার্শ্বে শয়ন করিলেন।

গাছের কাঁচা ছাল দিয়া, সকলে তাঁহাকে সেই চিতার সহিত বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর চিতার চারিদিকে সকলে আগুন দিয়া দিলেন। আগুন দিয়া, বড় বড় কঞ্চির বোঝা, বড় বড় শরের বোঝা, বড় বড় পাকাটির বোঝা, চারিদিক হইতে সকলে ঝুপঝাপ করিয়া চিতার উপর ফেলিতে লাগিলেন। বাদ্যকরদিগের ঢাক ঢোলের কোলাহলে সকলের কর্ণে তালি লাগিল। চিতা ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আকাশ প্রমাণ হইয় অগ্নিশিখা উঠিল।

কঙ্কাবতী অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন! অতি সুখ-নিদ্রা! অতি শান্তিদায়িনী-নিদ্রা!!"

কঙ্কাবতী।। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।।

প্রারম্ভ

কাল : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক
স্থান : গঙ্গাবক্ষ

পাঁচই আষাঢ়। গ্রহণের অমাবস্যা গেছে গত পরশু। তিন দিন তিন রাত ধরে ক্রমাগত ঝড়বৃষ্টিতে বাতাস এখন ঠান্ডা শীতল। পুণ্যসলিলা গঙ্গার বুকে ভাসছে এক বজরা। নোঙর করা, স্থির।

বজরার কেবিনে বছর চল্লিশের এক বাঙালি পুরুষ। মুখার্জিবাবু। সামনে খোলা খাতা। এক বিশেষ ছবি তিনি এঁকে রাখছেন খাতার পাতায়। চিন্তামগ্ন হয়ে বসেছিলেন তিনি। সকালের শীতল আবহাওয়াতেও তাঁর গৌরবর্ণ মুখে চন্দনের মতো ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। এক বহু দুর্মূল্য জিনিসের খোঁজ পেয়েছিলেন তিনি মাসখানেক আগে। গতকাল রাতে সেই দুর্মূল্য বস্তুর প্রকৃত শক্তির আভাস তিনি পেয়েছেন। সেই উত্তেজনাতেই তাঁর আয়ত চোখদুটো ঝকঝক করছিল।

একটা অর্থহীন বোবা শব্দে মুখার্জিবাবু মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন। পাশেই লাগোয়া আরেকটা ছোটো ঘর। এই ছোটো বজরায় দুটোই মাত্র ঘর। একটি ঘরে তিনি পড়াশোনা করেন। অন্যটা তাঁর শয়নকক্ষ। শয়নকক্ষের দরজার সামনে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এক মুণ্ডিতকেশী বালিকা। বালিকার অঙ্গে একটি কোরা ধুতি। ধুতিটিও তাঁরই।

দিন তিনেক আগে ঝড় শুরু হওয়ার পরে পরেই, এই বালিকাকে তিনি উদ্ধার

করেছেন উত্তাল গঙ্গা থেকে। একটা গাছের ডাল ধরে বালিকা খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছিল স্রোতের টানে। গতকাল সারাদিনের সেবা-শুশ্রূষায় বালিকা এখন দু-পায়ে খাড়া হয়েছে। তবে বালিকা এখনও একটা কথাও বলেনি। হয়তো এই বালিকা বোবা।

মুখার্জিবাবুর স্নেহময় হাসিতে বালিকা তার কাছে এগিয়ে এল। টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ে দেখল খাতায় আঁকা ছবিটা। এই মাথা ঝোঁকানোতেই মুখার্জিবাবুর নজর পড়ল বালিকার ঘাড়ের পিছনে। সেখানে একটা ছোটো উল্কি আঁকা। অর্ধেক পেখম মেলা একটি ময়ূর।

খাতার ছবিটা দেখতে দেখতে বালিকার চোখে ত্রাস ঘনালো। সে মুখার্জিবাবুর দিকে তাকিয়ে একবার সজোরে মাথা নাড়ল। মুখ দিয়ে অবোধ শব্দ করতে লাগল। মুখার্জিবাবুর মনে হল, সে বারণ করছে এই ছবি আঁকতে।

আঁকার খাতাটা তিনি সরিয়ে রাখলেন বালিকার হাতের সামনে থেকে। বালিকার থেকে তিনি এক বিশেষ জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন। বালিকাকে উদ্ধারের সময় তিনি দেখেছিলেন, বালিকার বুকে পিঠে ছবি আঁকা। সেই ছবি এক বিশেষ দুর্মূল্য রঙে আঁকা। গঙ্গার তীব্র স্রোতের সঙ্গে লড়াই করেও সেই রং সম্পূর্ণ ধুয়ে যায়নি। সেই রং যার খোঁজ তিনি শুরু করেছিলেন, আজ থেকে আট বছর আগে। যার খোঁজ এখনও শেষ হয়নি। তবে পরবর্তী পথের সন্ধান তিনি পেয়েছেন এই বালিকার থেকেই।

বছর আষ্টেক আগে, শুধুমাত্র একটা রঙের সূত্র ধরে তিনি মুঙ্গের এসেছিলেন। এক বিশেষ হরিদ্রাভ রং। সেখান থেকেই অভিযানের সূত্রপাত। সেই গোয়ালাপাড়ায় এমন কিছু কথা তিনি শুনেছিলেন, যা কিছুতেই শুধুমাত্র বানানো গল্প বলে ফেলে দিতে পারেননি। ঊনবিংশ শতকের সমগ্র ইউরোপ মাতানো সেই প্রাচ্য-পীত রঙের তলায়, আরও এক গোপন কাঁচা সোনা রঙের কিংবদন্তী খেলা করে বেড়াচ্ছিল।

'ওই হল বর্ণ-ঠাকুরের থান।' মুঙ্গেরের গোয়ালা আভূমিনত হয়ে প্রণাম করেছিল একটা আম গাছকে। সেই গাছতলাতে বসেই মুখার্জিবাবু প্রথম শুনেছিলেন "বর্ণ-ঠাকুর" অর্থাৎ রঙের দেবতার গল্প। শুনেছিলেন এক বিশেষ গুপ্ত গোষ্ঠীর কথা। শুনেছিলেন এক অলৌকিক শক্তিশালী স্বর্ণালি রঙের কথা। সে রং তো শুধু, রং নয়; সেই রঙে লুকিয়ে আছে দৈবীশক্তি। সেই রঙে দেবদর্শনও হয়।

মুঙ্গেরের সেই গোয়ালা-প্রতিনিধিকে তিনি অনেক টাকা কবুল করে এসেছিলেন, সেই গোষ্ঠী আবারও রং বানাতে এলে, তাঁকে যেন অতি অবশ্যই

খবর দেওয়া হয়।

আজ দীর্ঘ আট বছর পরে খবর এসেছে। খবর এসেছে মাস দেড়-দুই আগেই। গোয়ালা-সর্দারের কাছে বরাত এসেছে সেই অতি পবিত্র রং তৈরির। গোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা এসে নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছে রঙের উৎসস্থল। পুজো চড়েছে বর্ণ-ঠাকুরের থানে। এবারের মতো এত প্রচুর রং তৈরির বরাত গোয়ালা-সর্দার আগে কখনও পায়নি। হয়তো গোষ্ঠীর মানুষেরা বড়ো কোনো কিছু ঘটাতে চলেছে। খবর সংগ্রহের জন্যে মুখার্জিবাবু লোক বসিয়েছিলেন সেই গোয়ালা গ্রামে।

সেই খবরিই জানিয়েছিল, গোষ্ঠীর মানুষরা যাতায়াত করছে গোয়ালা-সর্দারের কাছে। উৎসব আছে, সামনের পূর্ণ সূর্যগ্রহণে। ভাগলপুরের কাছাকাছিই এক দ্বীপচরে হবে সেই ধর্মীয়-ক্রিয়াকাণ্ড। তিনি জানতেন, এই উৎসব কোনো সাধারণ উৎসব নয়। গুপ্তগোষ্ঠীর মূল-উৎসবটা দেখার খুব ইচ্ছা ছিল মুখার্জিবাবুর।

তা সম্ভব হয়নি। গত পরশু ছিল সেই সূর্যগ্রহণ। তিন দিন ধরে এই অঞ্চলে একটানা হয়ে চলেছে ঝড়বৃষ্টি। সকালের সূর্যকে ডুবিয়ে দিয়ে ঘনিয়ে এসেছিল রাতের আঁধার। এমন প্রলয়ংকর ঝড়বৃষ্টি বহুকাল দেখেননি মুখার্জি। একে সূর্যগ্রহণ, তায় এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মুখার্জিবাবু তাঁর অভিজ্ঞতায় জানেন এ অবস্থায় গঙ্গায় নৌকা নামানোর অর্থ মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। ঘাটে বাঁধা অবস্থাতেই শুধুমাত্র ঢেউয়ের আঘাতেই তাদের বজরা সমেত একটিও নৌকা আর আস্ত নেই। তিন দিন তিন রাত ওই প্রাকৃতিক তাণ্ডব চলেছে।

গতকাল রাত থেকে তাণ্ডবের সেই প্রাবল্য কমেছে কিছুটা। আজকে ঊষালগ্ন হতে না হতেই নৌকার খোঁজে গঙ্গার অন্য পাড়ে জেলেপাড়ায় লোক পাঠিয়েছেন তিনি। এখন বেলা দ্বিপ্রহর। এখনও নৌকা এসে পৌঁছায়নি। মুখার্জিবাবু বক্ষস্থলে হাত রাখলেন। খুবই কী দেরি হয়ে যাচ্ছে?

গঙ্গার মাঝখানের ওই দ্বীপ তাঁকে টানছে। তাঁর মনে হচ্ছে, কিছু একটা বিশেষ বস্তুর সন্ধান তিনি পেয়ে যাবেন এইবারে। তিনি জানে না কী সেই বস্তু। তবু গঙ্গাবক্ষে বসে তাঁর মনে হল, হয়তো এই পরাধীন দেশের সমস্ত দুঃখকষ্ট মিটিয়ে দেবে সেই বস্তু। নতুন করে গড়ে উঠবে এই শোষিত নিপীড়িত দেশ।

৵৵৵

জেলেপাড়া থেকে নৌকা এনে চরের উদ্দেশে যেতে যেতে মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেল। এখন আর মুখার্জিবাবু একা নন। সঙ্গে জনা তিনেক ব্রিটিশ রাজপুরুষও আছেন। তাঁদের সঙ্গে আছে বন্দুক, রাইফেল। এছাড়াও পাগড়িধারী দেশি লেঠেল সেপাই আছে জনাদশেক।

কলকাতার এই ইংরেজ পুলিশ অফিসার চেনেন মুখার্জিবাবুকে। ব্রিটিশ পুলিশের এই দলটাও জেলে পাড়ায় নৌকার সন্ধানে গেছিল। সেইখানেই মুখার্জিবাবুর কথা শুনে এসেছে তাঁর কাছে। ইংরেজ পুলিশ অফিসার মুখার্জিবাবুকে জানান।

হপ্তাখানেক আগে কলকাতা থেকে স্টিমারে করে জনা পঁচিশ অর্থবান খ্রিস্টান নারীপুরুষ এসেছিলেন এদিক পানেই। দলটা ছিল একটু বিশেষ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষজন ছিল সেই দলে। তিন দিন আগে ভাগলপুর থেকে দলটা উধাও হয়ে গেছে। এক স্থানীয় মানুষ জানিয়েছে, পরশু দিন ঝড় শুরু হওয়ার আগে কয়েকটা নৌকা নিয়ে দলটা গিয়ে নেমেছে একটা দ্বীপচরে। তারপর, গতকাল ঝড় থেমে যাওয়ার পরেও তারা আর ফিরে আসেনি। এতগুলি শ্বেতাঙ্গ নারীপুরুষ একযোগে হারিয়ে যাওয়ায় তারা তদন্ত শুরু করেছেন।

পার্শ্ববর্তী নৌকা থেকে ইংরেজি বাক্যালাপের টুকরো শব্দ ভেসে আসছিল। মুখার্জিবাবু-সহ ইংরেজরা সকলেই রানির ভাষায় কথোপকথন সারছিলেন। শুধুমাত্র দেশি সিপাহি আর মাঝিদের নির্দেশ দেওয়ার সময় ব্যবহার হচ্ছিল দেশীয় ভাষা। উত্তাল নদী ক্রমে খরস্রোতা হয়ে উঠছে। দুপুরবেলাতেই পাতলা কুয়াশার মতো মোড়কে ঢেকে গেছে নদীবক্ষ। আকাশ আজও মেঘলা। সকালের দিকে অল্পস্বল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। আজও কি ঝড় উঠবে নাকি? মুখার্জিবাবু অনেকক্ষণ ধরে ভুরু কুঁচকে কিছু একটা ভাবছিলেন। নৌকাগুলো কাছাকাছি এলে, মুখার্জিবাবুর উদ্দেশে একটা প্রশ্ন ছুটে এল।

"এত কী ভাবছেন, মিস্টার মুখার্জি? ভয় পেলেন নাকি?" ব্রিটিশ রাজপুরুষের ব্যঙ্গের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করলেন না তিনি। গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। উত্তাল নদী দেখে ভয় পাওয়ার মানুষ তিনি নন। পদ্মাপাড়ে তাঁর ছোটোবেলা কেটেছে। আড়িয়াল খাঁয়ের ভয়ংকর বান সয়েছেন তিনি। ছেলেবেলা থেকে ডাকাবুকো হিসাবে তাঁর যথেষ্ট নাম আছে। স্কুলে পড়াকালীন একবার ঠ্যাঙাড়ের দল তাঁকে অপহরণ করে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেখান থেকেও তিনি পালিয়ে বেঁচে এসেছেন। তিনি একজন স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ। চার বছর আগে ইংরেজ সরকারের আশীর্বাদধন্য হয়ে, কালাপানি পার করে, লন্ডন ঘুরে এসেছেন তিনি।

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তাঁরও বুক ঢিপ ঢিপ করছে। হাতের তালু ঘামছে। ওই অর্বাচীন ব্রিটিশগুলোর মতো অজ্ঞ মূর্খতায় সাহসী হয়ে উঠতে পারছেন না তিনি। তিনি জানেন, পরশু সূর্যগ্রহণ চলাকালীন ওই দ্বীপচরে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে

গেছে। সেই ঘটনার খানিক তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, স্বপ্নে! অথবা, স্বপ্ন নয়। গতকাল তিনি এক বিশেষ কাজ করেছিলেন। খবরি-গোয়ালা তাঁকে শুধু খবরই এনে দেয়নি। এনে দিয়েছিল ওই বিশেষ রঙের সামান্য অংশও। জলে ভেসে আসা ওই বালিকার অঙ্গে আঁকা সেই কক্ষা তিনি এঁকেছিলেন নিজের শরীরে। তারপরেই, তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক অলৌকিক জগৎ। এক ভয়ংকরী নারীমূর্তি। প্রজ্বলিত আগুনের বেড়ার মধ্যে বন্দিনী দেবী! তাঁর প্রচণ্ড হুহুংকারে কাঁপছিল সেই জগৎ। দেবী অভিশাপ দিচ্ছিলেন মানুষকে। ধ্বংসের অভিশাপ। মৃত্যুর অভিশাপ। আর... আর... দেবীর শরীর থেকে খসে খসে পড়ছিল এক অপূর্ব অলংকার!

নৌকাগুলো আচমকা ধীরগতি হয়ে গেল। সবার নাকে একটা উদগ্র গন্ধ প্রবেশ করছে। একজন ইংরেজ সামান্য নড়েচড়ে বসল। প্রশ্ন করল, 'কীসের গন্ধ এটা?'

পাশের নৌকা থেকে অন্য একজন হাত নাড়লেন। 'আশপাশে পচা মড়া ভেসে যাচ্ছে হয়তো। কালকের ঝড়ে দু-চারটে গোরু-মোষ মরবে না তা হয়!'

ইংরেজ পুলিশরা ব্যাপারটাকে যত সহজে উড়িয়ে দিল দুই নৌকার মাঝিদের মুখ দেখে তা মনে হল না। তারা বিড়বিড় করে কীসব যেন বলতে লাগল। তাদের চোখে মুখে অসন্তোষের ছায়া। এই চরে তারা আসতে চাইছিল না। বহু টাকার বিনিময়েও না। পুলিশি ধমক-চমকে অবশেষে আসতে বাধ্য হয়েছে। নৌকা যতই এগোচ্ছে, ততই কুয়াশা বাড়ছে, সঙ্গে গন্ধও। একসময় কুয়াশা কেটে গেল, আচমকা গন্ধটাও উধাও হয়ে গেল। মাত্র হাত কুড়ি দূরেই দ্বীপচরটাকে পরিষ্কার দেখা গেল।

চরটা বেশ বড়ো। এখানকার প্রকৃতি অনুযায়ী বালুচর, বালুচর পেরিয়ে শরবন আর বুনো ঝোপের জঙ্গল। তারপরে বড়ো বড়ো গাছ। চরটায় কী যেন একটা ঠিক নেই। মুখার্জিবাবু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন।

তখনি পাশ থেকে ব্রিটিশ পুলিশকর্তা বলে উঠলেন, 'দ্বীপটা কালকের ঝড় থেকে খুব বেঁচে গেছে। কি বলো হে?'

হ্যাঁ। তাই তো! মুখার্জিবাবু চমকে উঠলেন। দ্বীপে গতকালের ভয়ংকর ঝড়ের চিহ্নমাত্র নেই। শরবন মাটিতে শুয়ে পড়েনি, গাছগুলো দিব্যি ঝাড়ালো মাথা নিয়ে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছে। যেরকম ধ্বংসলীলা এতক্ষণ তারা নদীর দুই পাড়ে দেখতে দেখতে এসেছেন, তাতে মাঝে মাঝে মুখার্জিবাবুর মনে হচ্ছিল আদৌ চরটা টিকে আছে তো! এখন দেখা যাচ্ছে চরটির গায়ে আঁচড়টুকুও লাগেনি।

নৌকা দুটো এসে বালিতে ঠেকল। লেঠেল আর ইউরোপিয়ান যুবকদের নিয়ে চরের ভিতরে পা বাড়ালেন মুখার্জিবাবু। মাঝিদের কিছুতেই রাজি করানো গেল

না নৌকা থেকে নামাতে। বন্দুক উঁচিয়ে দুই তরুণ মাঝিকে টেনে নিয়ে আসা হল, জামিন স্বরূপ। অন্যান্য মাঝিরা যাতে নৌকা নিয়ে পালিয়ে না যায়।

বালুচর, শরবন, তারপর বড়ো বড়ো গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে পায়ে হাঁটা শুঁড়িপথটা দেখিয়ে দিল মুখার্জিবাবুর চর। জঙ্গলটা পার হতেই, গ্রামটা নজরে এল তাঁর। প্রাথমিক দর্শনে মনে হয়, অন্ত্যজদের গ্রাম। খান আষ্টেক শরগাছের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘর। মধ্যে সরু পায়ে হাঁটা পথ।

সরু মাটির রাস্তাটা দিয়ে সবাই লাইনবদ্ধভাবে এগোতে থাকল। দুজন দুজন করে।

একজন পুলিশ বাতাসে নাক টানল। গন্ধটা মুখার্জিবাবুও পেলেন। মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধ। এখানে আশপাশে কোনো শ্মশান আছে নাকি? প্রশ্নের উত্তরে খবরি জানাল, তেমন কিছু আছে বলে সে জানে না।

গ্রামের মধ্যে ঢুকতে মুখার্জিবাবুর একটু খটকা লাগল। চরের গাছপালা সেইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি তিনি আগেই দেখেছেন। তবে এই কাদামাটি, ছাঁচাবেড়া আর শরের ছাউনি দেওয়া ঘরগুলোতেও ঝড়ের বাতাসটুকু পর্যন্ত লাগেনি। অথচ, সামনের কর্দমাক্ত রাস্তাটা নোংরায় ভরতি। জঞ্জাল, নোংরা কাপড়চোপড়, ঝুড়ি, আধভাঙা মাটির হাঁড়ি থেকে মুরগির কাঁচা রক্ত-লাগা পালক পর্যন্ত মাটিতে ছড়িয়ে আছে। একটা ছেঁড়া দড়ির খাটিয়াও রাস্তার মাঝখানে উলটে থাকতে দেখল ওরা।

ঝড় যদি দ্বীপটাকে এড়িয়েই যায়, তাহলে এখানে কীসের তাণ্ডব হয়েছে!

ঘন সন্নিবদ্ধ ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে এগোনর সময় কারোর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সবাই কী দেবতার থানে গিয়ে জড়ো হয়েছে নাকি? অবশ্য মুখার্জি জানেন এরকম গ্রাম্য উৎসবের পরে এক-দু-দিন গ্রামের লোকেদের হদিস পাওয়া যায় না। তারা সবাই হাঁড়িয়া টেনে উলটে থাকে।

'মুখার্জি, লুক!' এক ইংরেজ সাহেব মুখার্জির কাঁধ খামচে ধরল।

মুখার্জিবাবু-সহ সকলে মুখ ফিরিয়ে দেখল। দৃশ্যটা খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। দুটো বাড়ির মধ্যে এক ফালি সবজির বাগান। বাগানের এক পাশে একটা খোঁটার পাশে দুটো ছাগলের মাথা গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছাগলের শরীরদুটো বাগানের অন্যপ্রান্তে। কেউ ধারালো কিছু ব্যবহার করে ছাগলদুটোর নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করেছে। কিয়দংশ ছড়িয়ে আছে বাগানের মাটিতে, অবশিষ্ট ঝুলছে বাগানের বেড়ার উপরে।

এক ইংরেজ যুবক লাফ মেরে এগিয়ে গেল ছাগলের মাথাটার কাছে। গলার এক পাশে দড়িটা এখনও লেগে আছে। কেউ বুঝি অতি দ্রুত ছাগলটার দেহটা টান মেরে ছিঁড়ে এনেছে মুণ্ডু থেকে। দড়ি খোলারও ফুরসত পায়নি। অন্য ইংরেজ যুবক মাথা নেড়ে নিজের রাইফেলটা বাগিয়ে ধরল। মুখার্জিও চাদরের তলা হাতড়ে

পিস্তলটা বের করলেন। গ্রামটার ব্যাপার স্যাপার ঠিক সুবিধার ঠেকছে না। হতে পারে গতকালের উৎসবের এটা কোনো প্রথা। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে ঠাকুরের থান ছেড়ে এই সবজি বাগানের মধ্যে কেন!

সূর্যের আলো মরে আসছে। এখনও পর্যন্ত একজন মানুষেরও দেখা পাওয়া যায়নি। অথচ, এই গ্রামে কমপক্ষে জনা বিশেক মানুষ থাকার কথা। মুখার্জিবাবু ঠিক করলেন তাড়াতাড়ি গ্রামটা একবার দেখেই ফিরে যাবেন তিনি। পুলিশরা যা পারে করুক। দলটা দ্রুত এগোতে লাগল গ্রামের শেষ প্রান্তের দিকে। একটা বড়োসড়ো টালির ঘরের পাশ দিয়ে রাস্তাটা বেঁকে গেছে। মাংস পোড়ার গন্ধটা অতি বিকট হয়ে নাকে এসে ঠেকছে। ক্ষীণ একটা ধোঁয়ার রেখাও দেখা গেল টালির ঘরের পিছন দিয়ে আকাশপানে উঠে যাচ্ছে।

'আজকেও ক্রিয়াকাণ্ড চলছে নাকি?' একজন বলে উঠল।

মুখার্জিবাবুর অন্য কিছু সন্দেহ হচ্ছিল। তিনি দ্রুত বাকি রাস্তাটা টপকে টালির ঘরটা পিছনে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওহ্! নারায়ণ! নারায়ণ!'

বাকিরাও হুড়মুড় করে এসে দাঁড়াল। টালির ঘরের বেশ খানিকটা পিছনে জঙ্গলের প্রায় ধার ঘেঁষেই একটা বিশাল চিতা জ্বলছে। এখন প্রায় নিভু নিভু, কিন্তু এখনও নিভে যায়নি। এই গ্রামে কালকে রাতে কাউকে সতী করা হয়েছে! অস্ফুটে বলে উঠলেন মুখার্জিবাবু। কাঠের আড়াল থেকে মুখটা দেখা না গেলেও, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল হতভাগ্য মেয়েটা নিতান্তই তরুণী।

'ড্যাম। ওই জন্যেই গ্রামের লোকগুলো পালিয়েছে।' গোয়েন্দা পুলিশ বলে উঠলেন।

ব্রিটিশ সরকার আইন করে, সতীদাহ বন্ধ করার পরেও প্রচুর জায়গায় এখনও এই ঘটনা ঘটে চলেছে। খবর পেলে পুলিশ এসে ধরপাকড় করে, সেইজন্যে অনেক সময় কার্যসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই লোক পালিয়ে যায়। লোকালয় থেকে দূরে এই চর থেকে অবশ্য খবর বাইরে যাওয়ার তেমন উপায় নেই। কিন্তু এই গ্রামের কোনো কিছুই তো স্বাভাবিক নয়। বসতির এত কাছেই কেউ কী শ্মশানকার্য করে? এরকম তো মুখার্জিবাবু কখনও দেখেননি। আর এই জায়গাটাকে তো শ্মশান বলেও মনে হচ্ছে না। এটা তো একটা ঠাকুরের থান। ওই তো পাশেই লাল সুতো বাঁধা একটা পাকুড় গাছ। ঠাকুরের থানে চিতা জ্বালানো হয়েছে—বিস্মিত মুখার্জিবাবু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন চিতার কাছে।

কাছে গিয়ে আবারও চমকালেন মুখার্জিবাবু। এই তরুণীকেই তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন! সেই প্রচণ্ডা দেবী! সেই দেবীকে সতী করা হয়েছে! তরুণীর পাশে আরেকটা পুড়ে কাঠ হয়ে যাওয়া পুরুষ দেহ, তবে মেয়েটির শরীর এখনও পুড়ে যায়নি। বাঙালি মেয়ের মুখখানি এখনও প্রভাময়। তরুণীর গায়ে মাখানো সোনালি

রংটা আগুনের তাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় কাঁচা সোনার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। দেহটা এক অদ্ভুত জালের আবরণে মোড়া। সাদা ধাতব অতীব চিকন এক জাল। এরকম কখনও দেখেননি তিনি। মুখার্জিবাবু লক্ষ করলেন, মেয়েটির একটা হাত কনুই থেকে কাটা।

একজন সিপাহি এগিয়ে এসে, মুখার্জিবাবুর পাশে দাঁড়ানো পুলিশকর্তাকে জিজ্ঞেস করল, ওরা আবার আগুনটা খুঁচিয়ে দেবে, নাকি চিতায় জল ঢেলে এই আধপোড়া দেহ দুটোকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে?

'মেয়েটার দেহ চিতা থেকে নামাও। নিয়ে চলো নৌকায়। অন্য দেহটা ভাসিয়ে দাও।'

আদেশটা পুলিশকর্তা দেননি। দিয়েছে কোটপ্যান্ট হ্যাট পরা আরেক ইংরেজ যুবক। এই যুবক ব্রিটিশ নয়, অন্য কোনো ইউরোপিয়ান বংশদ্ভুত। আদেশ শুনে মুখার্জিবাবু ভুরু কোঁচকালেন। এই দেবীর অন্তিম-সংস্কার সঠিকমতো হওয়া প্রয়োজন। এই দেহকে পুড়িয়ে ছাই করেই দেওয়া উচিত।

সিপাহিরা জল ঢেলে চিতাটাকে নেভাতে ব্যস্ত হয়ে পরে। মুখার্জিবাবু সরে আসেন, পাকুড় গাছটার কাছে। পাকুড় গাছের দিকে এগোতেই, মুখার্জিবাবু চোখে পরে মাটির উপরে পরে আছে তরুণীর কাটা হাতের অংশ! সোনালি রঙে রাঙানো! এই হাতেও জড়িয়ে আছে সেই অদ্ভুত সাদা ধাতব জালিকা। কোনোকারণে সেটা চিতা থেকে বেশ খানিকটা দূরেই সরে এসেছে। মুখার্জিবাবু হাঁটু গেড়ে বসেন হাতটার পাশে। জালিকাটা টেনে খোলার চেষ্টা করেন। পারেন না। হাতটা মুঠো করা। মুখার্জিবাবু দেখতে পান মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে একটা ছোটো গোলক। রক্তবর্ণের।

কেউ একজন পাশে এসে দাঁড়াতেই, মুখার্জিবাবু চমকে উঠে মুখ তোলেন। সেই ইউরোপিয়ান যুবক। কাটা হাতটাকে সে অবহেলায় একটা গামছায় মুড়িয়ে তুলে নিল। ঢুকিয়ে নিল নিজের পিট্‌ঠু ব্যাগে।

প্রায় একই সঙ্গে শোনা যায় সিপাহিদের আতঙ্কিত চিৎকার।

আর পুলিশকর্তার উদ্‌বিগ্ন স্বর, 'হেই, সকলে এক্ষুনি এখানে এস!'

চিতার পিছন দিকের জঙ্গল লাগোয়া একটা কুয়ো। পুলিশকর্তা কুয়োতে ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা দেখছে। মুখার্জিবাবু তড়িঘড়ি এগিয়ে যান সেই দিকে। কুয়োর ভিতরটা দেখে মুখার্জিবাবুর ইস্পাত কঠিন স্নায়ুও টলে যায়। ভিতরের জলে ভাসছে শবদেহ। রক্তাক্ত। ছিন্নভিন্ন ইউরোপিয়ান শেতাঙ্গ মৃতদেহ!

একে একে শবদেহগুলোকে তুলে আনা হয় কুয়োটা থেকে। আটটা মানুষ। আটজনই বিদেশি। জনা দুয়েক মিসমিসে কালো চামড়ার মানুষ। অক্ষত নয় একটা দেহও! চামড়া উঠে গেছে, মাংস খুলে এসেছে, দলামোচড়া হয়ে যাওয়া বীভৎস

অধ্যায় ১

উজ্জ্বল সোনালি এক ফাগুনি দুপুরে বাতাসে সুতীব্র ধ্বনি উঠল। তীক্ষ্ণ শব্দটা বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই একটা দূরপাল্লার শিয়ালদাগামী ট্রেন ঝড়াং ঝড়াং শব্দ তুলে দ্রুতগতিতে পেরিয়ে গেল বিশাল ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল আর সংলগ্ন মাঠটা।

মাঠ থেকে কহ্লা সতৃষ্ণ চোখে দেখল লম্বা রেলগাড়িটা। বহুকাল কোথাও যাওয়া হয়নি। শুধু স্কুল আর বাড়ি। বাড়ি আর স্কুল। এবারে পরীক্ষাটা হয়ে গেলে কহ্লা কোথাও একটা বেড়াতে যাবে। হুইল চেয়ারের হাতলে হাত বোলায় কহ্লা। বছর দুয়েক হল অ্যাক্সিডেন্টে কহ্লার হাঁটার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। কোথাও যাওয়া হয় না তার। কোথাও যেতে ইচ্ছাও হয় না। অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে গাড়িতে সে চাপতে ভয় পায়।

ঝমঝম শব্দ তুলে রেলগাড়িটা মিলিয়ে গেলে কহ্লা মুখ ফিরিয়ে এদিক ওদিক দেখে। সকালটা বেশ ভালোই ছিল। গতকাল রাতে হালকা বৃষ্টি হয়েছে, ভোরের দিকে বেশ একটা কনকনে ঠান্ডার রেশ মিশে ছিল শহরের বুকে। এখন অবশ্য চড়া রোদ্দুর এসে ঝলসে দিচ্ছে কহ্লার গাল। মাঠে বসে থাকা ছাত্রছাত্রীদের গল্পগাছা বন্ধ হয়ে গেছিল কয়েক মিনিটের জন্যে। ট্রেনটা চলে যেতেই আবার কলকল্লোল শুরু হল। সামান্য দূরের একটা দলের উচ্চকিত মেয়েলি হাসির শব্দে কহ্লার ভুরু কুঁচকে ওঠে। তেতো মুখে সামান্যক্ষণ মেয়েগুলোকে দেখে।

“বেহায়ার বালাই দূর, কাটা কানে ঝিঙ্গা ফুল” হাতের মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ডটা ব্যাগে ঢোকাতে ঢোকাতে মুখ টিপে ছড়া কাটে কহ্লা। কহ্লার হুইল

চেয়ারের পায়ের কাছে বসে হিরণ্য বসেছিল। দু-হাতে ছোটো একটা স্ক্রিনে ভিডিয়োগেম খেলছিল সে। কহ্লার স্বগতোক্তিতে তার মনঃসংযোগ বিঘ্নিত হল। ভিডিয়োগেম স্ক্রিনে ছয় বিন্দুর ছোটো গাড়িটা ক্র্যাস করল রাস্তার ধারে।

গেম খেলা থেকে ফুরসুত পেয়ে হিরণ্য হাঁ করে তাকায় কহ্লার মুখের দিকে, বলে, 'হোয়াট!'

"বেহায়ার বালাই দূর, কাটা কানে ঝিঙ্গা ফুল।" কহ্লা আবারও কথাটা বলে অদূরেই তিন-চারটে মেয়ের জটলার দিকে চোখের ইশারা হানে।

স্কুল ড্রেস পরা একটা মেয়ে দামি সারভোস্কি পাথর সেটিং নতুন কানের দুল কিনেছে, সেটাই দেখাচ্ছে সে বাকিদের। একদম হিরের মতো পলকাটা। নীলচে বড়ো একটা ঝোলানো টাব, পাশে ছোটো ছোটো গাঢ় নীল পাথর সেট করা। সারভোস্কি ক্রিস্টাল। যথেষ্ট দামি।

হিরণ্য মুচকি হেসে বলল। "হ্যাঁ দেখেছি। ওর বাবা নাকি গিফট করেছে।"

"বাবা কী রে! বল, চিনিবাবা।" কহ্লা বলে উঠল।

"কী বললি? চিনিবাবা! মানে, মানে..."

"সুগার ড্যাডি।"

"হাঃ হাঃ। স্যাভেজ! স্যাভেজ!" হেসে উঠে হিরণ্য লম্বা হাত বাড়িয়ে কহ্লার পিঠ চাপড়ে দেয়। তারপরে বলে, "চিনি বাবা তো বুঝলাম! তুই কী করে জানলি?"

"সবাই জানে। ওপেন সিক্রেট। ক্লাস নাইনের পাঞ্চালী ওদেরকে দেখেছিল। গরমের ছুটিতে, মন্দারমণিতে। বলছিল, লোকটা নাকি বীভৎস বড়োলোক। বাবা ছেড়ে দে, জ্যাঠার বয়সি হবে।"

হিরণ্য মুখ বিকৃত করে, "শালা! এদিকে নিত্যনতুন বয়ফ্রেন্ড। প্রতিদিন নতুন নতুন গাড়িতে স্কুল আসা... আবার সুগার ড্যাডি জুটিয়েছে।"

"হুঁহ্! সাধে কী বললাম, বেহায়ার বালাই..."

"হাঃ। কোত্থেকে জোটাস এইসব ওল্ডিস বেঙ্গলি রাইমস? ন্যাস্টি।" হিরণ্য নাক দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করে।

"এটা রাইমস নয়, বাংলা প্রবাদ।"

হিরণ্য সরু চোখে মাঠের মাঝখানে বসা কানে ঝলমলে দুল পরা মেয়েটাকে মাপতে থাকে, মিচকি হাসে। বলে, "আমিও একবার টিঙ্কাকে প্রপোজ করব ভাবছি। ফর ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড অনলি।"

শব্দ করে হেসে উঠল কহ্লা, "কত সাধ যায় রে চিতে, বেগুন গাছে আকঁশি দিতে।"

হিরণ্য একবার কহ্লার দিকে তাকাল। বহুদিন এইভাবে কহ্লাকে সে হাসতে দেখেনি। মেয়েটা আজকাল প্রায় সময়ই বিষণ্ণ থাকে। বিশেষ করে পরীক্ষার সময়